ইউনিট

১১ তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রিঃ)

ভূমিকা

১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র চার বছরের মধ্যে খলজী বংশের অবসান ঘটে। এই বংশের শেষ সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারককে হত্যা করে খসরু মালিক নামক একজন আমীর ক্ষমতা দখল করেন। জন্মসূত্রে তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু। সিংহাসনে বসার পরও তিনি নীচ-স্বভাব ও মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেন নি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অপ্রিয় হয়ে পড়েন। তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমীরগণ ঐক্যবদ্ধ হন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে খসরু মালিক পরাজিত ও নিহত হন। আমীরদের বিশেষ অনুরোধে গাজী মালিক সিংহাসনে বসতে রাজী হন। সিংহাসনে বসার সময় তিনি গিয়াসউদ্দীন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করেন । এভাবে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, মুহম্মদ বিন-তুঘলক এবং ফিরোজশাহ তুঘলক এই বংশের তিনজন বিখ্যাত সুলতান। মুহম্মদ বিন-তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ফিরোজশাহ তুঘলক জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থাকে 'মাতামহীসুলভ শাসনব্যবস্থা' বলা হয়। ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনামল থেকেই তুঘলক বংশের পতন শুরু হয়। তৈমুর লং ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণের ফলে তুঘলক বংশের জীবন প্রদীপ এক ফুৎকারে নিভে যায়। তুঘলক আমলে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। এ যুগে ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়।

পাঠ ১

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গিয়াসউদ্দীন তুঘলক যে অবস্থায় দিল্লীর সিংহাসনে বসেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- তিনি কিভাবে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলার শাসন ব্যবস্থায় তিনি যে সব পরিবর্তন আনেন তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মানুষ ও শাসক হিসেবে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পূর্ব নাম গাজী মালিক। তিনি ছিলেন তুর্কি জাতির করৌনা (Qarauna) গোষ্ঠির লোক। তাঁর পিতা বলবনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি পাঞ্জাবের এক জাঠ রমণীকে বিয়ে করেন। গাজী মালিক ছিলেন এই দম্পতির সন্তান। সুতরাং তাঁর ধমনীতে তুর্কী ও রাজপুত রক্তের সংমিশ্রণ ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর আমলে তিনি উচ্চ রাজকাজে নিযুক্ত হন। জাফর খানের মৃত্যুর পর তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করে তিনি সুলতানের সন্তুষ্টি এবং আমীরগণের আস্থা অর্জন করেন। এজন্যই তাঁর উপর খসরু মালিককে ক্ষমতাচ্যুত করার নেতৃত্ব বর্তায়। খসরু মালিককে হত্যা করার পর খলজী বংশের কোন রাজকুমারকে সিংহাসনে বসানোর জন্য তিনি আমীরদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। তখন আমীরগণ তাঁকেই সিংহাসনে বসান। সিংহাসনে বসার সময় তিনি গিয়াসউদ্দীন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশই তুঘলক বংশ নামে পরিচিত।

শান্তি প্রতিষ্ঠা

সিংহাসনে বসেই তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। প্রথমেই তিনি রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মন দেন। আলাউদ্দীনের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের এবং খসরু মালিকের কুশাসনে দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। খসরুর অত্যাচারে যে সমস্ত অভিজাত ও আমীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তিনি তাঁদের পুনর্বহালের ব্যবস্থা করেন। যে সমস্ত আমীর খসরুর কাছে থেকে অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন সে সমস্ত আমীরদের তিনি প্রাপ্ত অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী রাজকোষে জমা দিতেও বাধ্য করেন। নিজামউদ্দীন আওলিয়া যে অর্থ পেয়েছিলেন তা তিনি দিল্লীর গরীব-দু:খীর মধ্যে বিলিয়ে দেন। তাই তিনি রাজকোষে অর্থ জমা দিতে পারেন নি। এ জন্য সুলতান তাঁকে পর্যন্ত কারারুদ্ধ করেন। ফলে দরবেশের সাথে সুলতানের মনোমালিন্য হয়।

দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা

অত:পর সুলতান দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। তিনি পুত্র জুনা খান ওরফে মুহম্মদকে বরঙ্গল অভিযানের নির্দেশ দেন। প্রথম চেষ্টায় মুহম্মদ ব্যর্থ হন। তবে তাঁর দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হয়। এরপর সুলতান নজর দেন বাংলার দিকে। বহুদিন ধরে বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব ছিল না বললেই চলে। শামসউদ্দীন ফিরোজ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করছিলেন। ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাংলার সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাঁধে। শামসউদ্দীন ফিরোজের জ্যেষ্ঠপুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অপর পুত্র নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম এতে অসন্তুষ্ট হন। ঠিক এই সময় গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি পুত্র মুহম্মদকে দিল্লীতে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে রেখে আসেন। প্রথমে তিনি ত্রিহুত জয় করেন। নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম ত্রিহুতে এসে সুলতানের সাথে দেখা করেন। তিনি নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুলতানের সাহায্য চান। সুলতান তাঁর পালকপুত্র বাহরাম খানকে একদল সৈন্যসহ নাসিরউদ্দীনের সাথে পাঠালেন। যুদ্ধে বাহাদুর পরাজিত হন। তাঁকে গলায় দড়ি বেঁধে সুলতানের সামনে হাজির করা হয়। ইতিমধ্যে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক লখনৌতি অধিকার করেছেন। তিনি বাংলার মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লখনৌতি এই তিন ভাগে ভাগ করেন। লখনৌতির শাসনকর্তা করা হয় বাহরাম খান ওরফে তাতার খানকে।

নিহত হওয়ার ঘটনা

অত:পর তুঘলক দিল্লী রওয়ানা হন। বাহাদুরকে তিনি সংগে নেন। কিন্তু দিল্লী পৌঁছার আগেই আফগানপুরে এক দুর্ঘটনায় সুলতান নিহত হন। কোন কোন ঐতিহাসিক গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পেছনে তাঁর পুত্র মুহম্মদের হাত ছিল বলে মনে করেন। সুলতানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জুনা খান ওরফে মুহম্মদ দিল্লীর উপকণ্ঠে আফগানপুরে একটি মন্ডপ তৈরি করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সুলতান যখন হাত ধুচ্ছিলেন, তখন মন্ডপটি ধ্বসে পড়ে। এতে সুলতান তাঁর কনিষ্ঠপুত্রসহ চাপা পড়েন এবং মারা যান। মুহম্মদের বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, মুহম্মদ তাঁর পথ নিষ্কন্টক করার জন্য মন্ডপটি এমনভাবে নির্মাণ করেছিলেন যাতে সামান্য ধাক্কাতেই এটা ধ্বসে পড়ে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটিকে একটি দুর্ঘটনামাত্র মনে করেন। তাঁদের মতে, এর জন্য মুহম্মদ কোনভাবেই দায়ী ছিলেন না। গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের এই আকস্মিক মৃত্যুর পর জুনা খান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। উপাধি গ্রহণ করেন মুহম্মদ বিন-তুঘলক।

চরিত্র-কৃতিত্ব

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক প্রজাদরদি শাসক ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর শাসনামলে (১৩২০-১৩২৫ খ্রি:) তিনি সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটান। তিনি রাজস্ব কমিয়ে উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৬}$ ধার্য করেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করায় সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পায়। শূন্য কোষাগার আবার পূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি কর্মচারীদের সততা ও বিশ্বস্ততার উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন, ভাতা ও পদোন্নতি দেয়া হতো। তাঁর সতর্ক দৃষ্টির ফলে অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় আসে। অনেকগুলো খাল খনন করে তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করেন। জলসেচের ব্যবস্থা করায় ফসলের

উৎপাদন বেড়ে যায়। দস্যুর কবল থেকে প্রজার জানমাল রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সুলতান দুর্গগুলোতে প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করেন। দিল্লীর সাথে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে যুক্ত করার জন্য অনেকগুলো রাস্তা ও পুল নির্মাণ করা হয়। এতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কোন কারণে ফসলের উৎপাদন কম হলে তিনি প্রজাদের রাজস্বের হার আরও কমিয়ে দিতেন। কখনো কখনো একেবারেই মাফ করে দিতেন। তিনি ঘোড়ার মাধ্যমে একস্থান থেকে আরেকস্থানে সরকারি চিঠিপত্র আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ভারতে এই ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেন। এই ব্যবস্থাকে 'উলাক' বলা হতো।

তুঘলক ঘোড়ার মাধ্যমে একস্থান থেকে আরেকস্থানে সরকারি চিঠিপত্র আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ভারতে এই ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেন। এই ব্যবস্থাকে 'উলাক' বলা হতো

মানুষ হিসেবে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ছিলেন উদার ও মহানুভব। জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর দরবারে সমাদর পেতেন। স্বল্পকালীন শাসনামলে শাসক হিসেবে তিনি যে দক্ষতা দেখান তা এক কথায় বিস্ময়কর। শাসক হিসেবে তাঁকে পরবর্তীকালের শেরশাহের সাথে তুলনা করা যায়।

সার-সংক্ষেপ

খসরু মালিককে নিহত করে গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। উপাধি গ্রহণ করেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। প্রথমেই তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর পুত্র জুনা খান বরঙ্গল জয় করেন। সুলতান বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বাংলাকে তিনি লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে দেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে আফগানপুরে এক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। তিনি প্রজাদরদি সুলতান ছিলেন। তাঁর সময় কৃষির উন্নতি ঘটে। তিনি গুণীজনের সমাদর করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের দেহে সংমিশ্রণ ছিল–
- ক. আর্য ও অনার্য রক্তের।
- খ. তুর্কী ও মোঙ্গল রক্তের।
- গ. তুর্কী ও রাজপুত রক্তের।
- ঘ. তুর্কী ও আফগান রক্তের।

২। যুবরাজ মুহম্মদ জয় করেন দাক্ষিণাত্যের –
- ক. বরঙ্গল।
- খ. যাদবরাজ্য।
- গ. তেলিঙ্গনা।
- ঘ. পান্ড্য রাজ্য।

৩। বাংলার যে শাসককে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ক্ষমতাচ্যুত করেন তাঁর নাম–
- ক. গিয়াসউদ্দীন আয্ম।
- খ. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর।
- গ. নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম।
- ঘ. নাসিরউদ্দীন বুঘরা খান।

৪। প্রজার জান-মাল রক্ষার জন্য সুলতান–
- ক. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।
- খ. গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন করেন।
- গ. রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করেন।
- ঘ. স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গিয়াসউদ্দীন তুঘলক কি অবস্থায় দিল্লীর সিংহাসনে বসেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।
২. গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনেন, তা বিশ্লেষণ করুন।
৩. মানুষ হিসেবে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ২

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুলতানের কার্যাবলী মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ঘটনাবহুল রাজত্বকাল

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র জুনা খান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। উপাধি গ্রহণ করেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান সুলতান। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'যুগের বিস্ময়' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর শাসন করেন। এই ২৬ বছরের মধ্যে প্রথম ১৩ বছর দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি কতগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী সুলতানের পাঁচটি পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এই পরিকল্পনাগুলো ছিল দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন, খোরাসান অভিযান, কারাচিল অভিযান, প্রতীক মুদ্রার প্রচলন এবং দোয়াবে কর বৃদ্ধি। তিনি কতগুলো কারণে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দেবগিরির নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ রাখা হয়। কয়েক বছর পাত্রমিত্রসহ সুলতান সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতানের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুলতান খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। এজন্য তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অভিযানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। প্রায় দেড় বছর বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণের পর সুলতান এ পরিকল্পনাও ত্যাগ করেন। মাঝখান থেকে সুলতানের প্রচুর জনবল ও অর্থবলের অপচয় হয়। এরপর সুলতান স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তামার প্রতীক মুদ্রা প্রচলন করেন। জনগণ সুলতানের মহৎ পরিকল্পনা বুঝতে পারেনি। তদুপরি প্রতীক মুদ্রা জাল হতে থাকে। সুলতান বাধ্য হয়ে এ পরিকল্পনাও ত্যাগ করেন। সুলতানের সর্বশেষ পরিকল্পনা ছিল দোয়াবে কর বৃদ্ধি। সুলতানের মন্দভাগ্য। যে বছর তিনি কর বাড়ালেন সে বছর এবং তারপর কয়েক বছর দোয়াবে অনাবৃষ্টির জন্য অজন্মা হয়। প্রজারা বর্দ্ধিত হারে কর দিতে পারলো না। তারা বনে-জংগলে পালিয়ে যায়। সুলতানের কানে এখবর পৌঁছামাত্র এ পরিকল্পনাও তিনি ত্যাগ করেন। এসকল কারণে তাঁর বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকগণ সুলতানকে স্বেচ্ছাচারী, নিষ্ঠুর, খামখেয়ালী এমনকি কেউ কেউ তাঁকে পাগল পর্যন্তও বলেছেন।

তিনি ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর শাসন করেন

সুলতানের পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়। ফলে সুলতানের রাজত্বকালের শেষ তের বছর নানা রকম বিশৃ *খলা ও অশান্তি* র মধ্যে কাটে

সুলতানের পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়। ফলে সুলতানের রাজত্বকালের শেষ তের বছর নানা রকম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে কাটে। এই সময়ের মধ্যে বাংলা, গুজরাট, সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দেই দাক্ষিণাত্যে হরিহর ও বুক্কা রাও বিজয়নগর রাজ্য পত্তন করেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ পূর্ব বাংলার সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার শক্তিশালী শাসনকর্তা আইনুল মুলক বিদ্রোহ করেন। সুলতান তাঁকে দমন করেন। তাঁর পূর্ব বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করে সুলতান তাঁকে ক্ষমা করেন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন। তিনি সাতগাঁও-ও অধিকার করেন। ফলে সারা বাংলাই মুহম্মদ বিন তুঘলকের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে হাসান নামে একজন আমীর দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এসমস্ত কারণে অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে সুলতানের দিন যেতে থাকে। তিনি এক জায়গায় বিদ্রোহ দমন করেন তো আর এক জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। এভাবে ছুটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত সুলতান ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর থাট্টায় মৃত্যু বরণ করেন। সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করার জন্যই।

মূল্যায়ন

তিনি যে একজন অত্যন্ত উঁচু দরের পন্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে সবাই একমত। তিনি ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন

মুহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে একেক দল ঐতিহাসিক একেক ধারণা পোষণ করেন। তবে তিনি যে একজন অত্যন্ত উঁচু দরের পন্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে সবাই একমত। তিনি ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। সারাদিন রাজকাজে ব্যস্ত থাকতেন। আবার রাতের বেলা প্রাসাদের ছাদে উঠে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফ আগা-গোড়া তাঁর মুখস্ত ছিল। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁর অধীনে

অনেক হিন্দু উচ্চপদে আসীন ছিলেন। হিন্দুসমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা তিনি দূর করতে চেষ্টা করেন। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষকদের মধ্যে 'তাকাভি' ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের রাজকোষ থেকে সাহায্য করা হতো। তিনি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু হিসাব রাখার ব্যবস্থা করেন। বিচারকাজে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন। ন্যায়-বিচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। জ্ঞানী-গুণী ও আইন মান্যকারীদের প্রতি সুলতান ছিলেন যেমনি দয়ালু, তেমনি সদাশয়। আবার আইনভঙ্গকারী অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। কোন কোন ঐতিহাসিক এজন্য সুলতানকে 'বৈপরিত্যের সংমিশ্রণ' বলেছেন। তাঁর গৃহীত পরিকল্পনাগুলো ছিল যুগের থেকে অনেক অগ্রবর্তী। প্রজাগণ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। এজন্য তাঁর পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয়।

তাঁর গৃহীত পরিকল্পনাগুলো ছিল যুগের থেকে অনেক অগ্রবর্তী। প্রজাগণ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। এজন্য তাঁর পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয়

সার-সংক্ষেপ

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম তের বছর দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। এ সময়ের মধ্যে সুলতান দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, খোরাসান অভিযান, কারাচিল অভিযান, প্রতীক মুদ্রার প্রচলন, দোয়াবে কর বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জনসাধারণ তাঁর পরিকল্পনাগুলো বুঝতে পারেনি। ফলে সেগুলো ব্যর্থ হয়। এজন্য সুলতানের রাজত্বকালের দ্বিতীয় ১৩ বছর অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে কাটে। দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য স্বাধীন হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। সুলতান এসকল বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। সিন্ধুর বিদ্রোহ দমনকালে ক্লান্ত সুলতান মৃত্যু বরণ করেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন–
   ক. ফখরউদ্দীন মোবারক।
   খ. হাজী ইলিয়াস।
   গ. আলী মোবারক।
   ঘ. বাহরাম খান।

২। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন–
   ক. ১৩৩৮ সালে।
   খ. ১৩৪২ সালে।
   গ. ১৩৪৪ সালে।
   ঘ. ১৩৪৭ সালে।

৩। বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়–
   ক. ১৩৩০ সালে।
   খ. ১৩৩২ সালে।
   গ. ১৩৩৪ সালে।
   ঘ. ১৩৩৬ সালে।

৪। মুহম্মদ বিন তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন–
   ক. দিল্লীতে।
   খ. লখনৌতিতে।
   গ. থাট্টায়।
   ঘ. লাহোরে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মুহম্মদ বিন তুঘলকের ২৬ বছরের শাসনকালের উপর আলোচনা করুন।
২. মুহম্মদ বিন তুঘলকের কার্যাবলী সংক্ষেপে মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৩

মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- তাঁর খোরাসান ও কারাচিল অভিযান বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুলতানের প্রতীক মুদ্রা প্রচলন পর্যালোচনা করতে পারবেন।
- সুলতানের দোয়াবে কর বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ

জিয়াউদ্দীন বারণী বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী' প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক পাঁচটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে দোয়াবে কর বৃদ্ধি, দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন, তামার নোটের প্রচলন, খোরাসান অভিযান এবং কারাচিল অভিযান। তিনি এই পরিকল্পনাগুলো সময়ের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করেননি। আমরা কার্যকারণ বিবেচনা করে ঘটনাগুলোকে এভাবে সাজাতে পারি - দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন, খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা, কারাচিল অভিযান, প্রতীক মুদ্রা বা তামার নোটের প্রচলন এবং দোয়াবে কর বৃদ্ধি। নিম্নে ঘটনাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন

মুহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য একটিমাত্র কেন্দ্র অর্থাৎ দিল্লী থেকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। তিনি দাক্ষিণাত্যেও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের হুমকি সব সময়ই ছিল। সুতরাং সুলতান দাক্ষিণাত্যে একটি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। এজন্য তিনি বেছে নিলেন দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিকে। এর নতুন নাম দিলেন দৌলতাবাদ। সেখানে অনেক নতুন দালান-কোঠা নির্মাণ করা হলো। তিনি রাজকর্মচারীদের সাথে সাথে দিল্লীর কিছু সংখ্যক আলেম ও অভিজাতবর্গকেও দৌলতাবাদ যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দৌলতাবাদে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা। কিন্তু নতুন পরিবেশ অনেকেরই পছন্দ হয় নি। এতে লোকজনের অনেক কষ্ট হয়। অনেকেই পথে মারা যায়। সুলতানের খরচও হয় প্রচুর। কিন্তু সুলতানের পরিকল্পনা উদ্ভট ছিল না। বরং সেই চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় রাজধানীর কথা চিন্তা করা প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী একজন সুলতান। দিল্লীর লোকজনকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি তাদেরকে দৌলতাবাদে যাওয়ার নির্দেশ দেন নি। তিনি অন্ধ খঞ্জকে পর্যন্ত দিল্লীতে টেনে নিয়ে গেছেন, কুকুর বিড়ালও বাদ দেন নি, সুলতানের বিরুদ্ধে আনীত এ ধরনের অভিযোগ নিতান্তই অমূলক।

খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা

ট্রান্স-অক্সিয়ানার আমীর তারমাসিরিনকে খোরাসানের আমীর সোবহান বিতাড়িত করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে এসে তারমাসিরিন আশ্রয় নেন। সুলতান তাঁকে কোন রকমে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় দেন। বেশ কিছু খোরাসানি আমীরও সোবহানের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে সুলতানের দরবারে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারমাসিরিনের জামাতা আমীর নওরোজ এবং মিসরের শাসনকর্তা আন-নাসির সুলতানকে আশ্বাস দেন যে তারা খোরাসান অভিযানে তাঁকে সাহায্য করবেন। খোরাসানের উপর নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সুলতান ৩,৭০,০০০ -এর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়। খোরাসানের নতুন সুলতান আবু সৈয়দ ও মিসরের সুলতান নাসিরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠে। সুলতান খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এ অভিযান সফল হবে না, তখনই তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এখানে তিনি বাস্তব রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় দেন।

কারাচিল অভিযান

হিমালয়ের পাদদেশে একটা পার্বত্য অঞ্চলের নাম ছিল কারাচিল বা কুর্মাচল। এখানকার পাহাড়ি জাতি ছিল খুবই উদ্ধত প্রকৃতির। তারা মাঝে মাঝেই অতর্কিত আক্রমণ করে সুলতানের প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সুলতান তাই তাদের দমনের জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিন্তু ঝড়ের কবলে পড়ে তার বাহিনী ধ্বংস হয়। এব্যাপারে শুধু এটুকুই বলা যায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর সুলতানের কোন হাত ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে সুলতানের ইচ্ছা ছিল তিব্বত অভিযান করা। কিন্তু এরূপ অবাস্তব পরিকল্পনা সুলতানের মোটেই ছিল না।

প্রতীক মুদ্রার প্রচলন

দেশে সোনার অনুপাতে রূপার অভাব দেখা দিয়েছিল। তদুপরি দেশ থেকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা চিন্তা করে সুলতান বাজারে তামার নোট ছাড়েন। এ মুদ্রা ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রতীক স্বরূপ। অনেকটা আধুনিক কালের কাগজের টাকার মতো। তামার পাতে টাকার যে অংক বা পরিমাণ লেখা থাকতো তামার ধাতব মূল্য ছিল তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। ব্যাপারটি ছিল অভিনব। অবশ্যই এটি সুলতানের মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু অসাবধানতাবশত: মুদ্রা যাতে জাল না হয় সে ব্যাপারে টাকশালের কর্মকর্তারা কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। ফলে নকল প্রতীক মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গেলো। প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ি টাঁকশালে পরিণত হলো। দেশে চরম মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলো। প্রতীক মুদ্রার কোনটা আসল, কোনটা নকল তা চেনা কষ্টকর হয়ে পড়লো। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। সুলতান বাধ্য হয়ে বাজার থেকে প্রতীক মুদ্রা তুলে নিলেন। বিনিময়ে দেয়া হলো স্বর্ণমুদ্রা। সুযোগ পেয়ে অনেকেই জালমুদ্রাও জমা করতে লাগলো। রাষ্ট্রের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হলো। আসল-নকল উভয় প্রকার নোটের পরিবর্তে বিনিময়মূল্য শোধ করায় প্রমাণিত হয় যে সুলতান জনগণকে ঠকাতে চান নি। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে স্বর্ণমুদ্রার অভাবের কারণে তিনি তামার নোট প্রবর্তন করেন নি। সদাশয় সুলতানের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগও কোন কোন ঐতিহাসিক করেছেন। যাহোক, সুলতানের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হলো। আসলে এ পরিকল্পনাটি ছিল যুগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। সমসাময়িক জনগণ এটি বুঝতে পারেনি।

দোয়াবে কর বৃদ্ধি

দৌলতাবাদে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, খোরাসান ও কারাচিল অভিযান এবং প্রতীক মুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় রাজকোষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুলতান এ ক্ষতি যতোটা সম্ভব পুষিয়ে নিতে চাইলেন। দোয়াব অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। আলাউদ্দীন খলজী এ অঞ্চল থেকে উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{২}$ রাজস্ব আদায় করেছেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক একই হারে রাজস্ব আদায়ের আদেশ দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় পরপর কয়েক বছর দোয়াব অঞ্চলে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে ফসলহানি ঘটে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাজনা আদায়কারীগণ সুলতানকে দুর্ভিক্ষের কথা না জানিয়ে উৎপীড়ন করে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। অত্যাচারের ভয়ে প্রজারা বনে জংগলে আশ্রয় নেয়। চাষাবাদ অবহেলিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সুলতানের কানে খবর পৌঁছা মাত্র তিনি এর উপশম করেন। তিনি প্রজাদের মধ্যে তাকাভি ঋনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি প্রজাদের দেয় রাজস্বও মাফ করে দেন। কিন্তু সার্বিক চাষাবাদ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এজন্য জনগণ সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবং সে বিদ্রোহ দোয়াব ছাড়াও মালব, দিল্লী, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

সুলতানের এ সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় দেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুলতান উল্কার মত এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ছুটে বেড়াতে থাকেন। ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর থাট্টায় বিদ্রোহ দমনকাজে ব্যস্ত থাকার সময় তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

সার-সংক্ষেপ

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এর নাম দেন দৌলতাবাদ। কতকগুলো উদ্দেশ্যে সুলতান এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু আমীর ওমরাহদের বিরোধিতার জন্য তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুলতান খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। তাঁর কারাচিল অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুলতান স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বদলে তামার নোট চালুর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কর্মচারীদের অসাবধানতা এবং জনগণের অসাধুতা ও অসহযোগিতার জন্য এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। সুলতান দোয়াবে কর বৃদ্ধি করে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য তাঁর এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। তার পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হওয়ায় দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন–
ক. দেবগিরিতে।
খ. মাদুরায়।
গ. বরঙ্গলে।
ঘ. বিজয়নগরে।

২। ট্রান্সঅক্সিয়ানার যে আমীর মুহম্মদ বিন তুঘলকের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর নাম–
ক. আমীর ইকবালমন্দ।
খ. আমীর তারমাসিরিন।
গ. আমীর নওরোজ।
ঘ. আমীর তৈমুর।

৩। মুহম্মদ বিন তুঘলকের তামার নোট প্রচলন করান কারা–
ক. স্বর্ণমুদ্রার অভাব।
খ. জনগণকে ঠকান।
গ. বিদেশী বণিকদের ঠকান।
ঘ. স্বর্ণের অনুপাতে রৌপ্যের অভাব দেখা দেয়া।

৪। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করে মুহম্মদ বিন তুঘলক করের হার ধার্য করেন–
ক. উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ।
খ. উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৪}$ অংশ।
গ. উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{২}$ অংশ।
ঘ. উৎপন্ন শস্যের $\frac{৩}{৪}$ অংশ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মুহম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করুন।
২. মুহম্মদ বিন তুঘরকের কারাচিল অভিযান পর্যালোচনা করুন।

পাঠ ৪

মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- তাঁর চরিত্র পর্যালোচনা করতে পারবেন।

সুলতানের চরিত্রে ছিল বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। সুলতানের সমসাময়িক জিয়াউদ্দীন বারণী, ইবনে বতুতা, ইসামী প্রমুখ লেখক সুলতান সম্পর্কে বিপরীতধর্মী মন্তব্য করেছেন। সেজন্য এলফিনস্টোন, এডওয়ার্ড টমাস ও ভি.এ. স্মিথ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে সুলতানের চরিত্রে ছিল বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাঁরা সুলতানের চরিত্রে কিছুটা উন্মত্ততাও লক্ষ করেছেন। অপরদিকে গার্ডনার ব্রাউন বলেছেন যে সুলতান ছিলেন সদাশয় ও ভালো মনের অধিকারী একজন ব্যক্তি। পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাঁকে কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর হতে হয়েছে এবং ভয়ঙ্কর আদেশ দিতে হয়েছে। তবে এর জন্য তাঁর চরিত্রের উজ্বলতর দিককে আচ্ছন্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বরী প্রসাদ ও আগা মাহদী হুসাইন মধ্যযুগের শাসকদের মধ্যে মুহম্মদ বিন তুঘলককে অন্যমত শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সুলতান ছিলেন সদাশয় ও ভালো মনের অধিকারী একজন ব্যক্তি। পারিপার্শ্বিকতার কারণে তাঁকে কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর হতে হয়েছে এবং ভয়ঙ্কর আদেশ দিতে হয়েছে

প্রকৃতপ্রস্তাবে মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী শাসক। তিনি একজন উঁচু দরের পন্ডিত ছিলেন। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। লিপিবিদ্যায় তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এমনকি যারা পেশাগতভাবে লিপিবিদ্যা বিশারদ ছিলেন তারাও তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে সাহস পেতেন না। গ্রিক দর্শনে তাঁর ভালো দখল ছিল। অপরদিকে তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু ধার্মিক মুসলমান। তাঁর অপূর্ব স্মরণশক্তি ছিল। পবিত্র কোরআন শরীফ ছিল তাঁর আগাগোড়া মুখস্ত তাছাড়া বহু ফারসি বয়েত তিনি মুখস্ত করেছিলেন। তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হতো। সেখানে কাব্য, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে জমজমাট আসর বসতো। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল। প্রায়ই তিনি রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখতেন। সুলতান বাকপটু অথচ বিনয়ী ছিলেন। তিনি গরিব-দু:খীর মধ্যে অকাতরে দান করতেন। তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। বহু হিন্দু তাঁর অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি একজন উঁচু দরের পন্ডিত ছিলেন

তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু ধার্মিক মুসলমান। তাঁর অপূর্ব স্মরণশক্তি ছিল। পবিত্র কোরআন শরীফ ছিল তাঁর আগাগোড়া মুখস্ত

কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন এ কথা ঠিক। মধ্যযুগে স্বৈরাচার ছিল প্রচলিত রীতি। যুগধর্ম অনুসারে তিনি কোথাও কোথাও নিষ্ঠুরতাও প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবেই তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন একথা মেনে নেয়া যায় না। তাঁর উদারতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আইনুল মুলককে অপরাধী জেনেও তিনি তাঁর পূর্বের অবদান স্মরণ করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। সুলতান পাগল ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার যুগের জনসাধারণ অপেক্ষা চিন্তা-চেতনায় অনেক বেশি অগ্রসর। জ্ঞানে, গুণে, প্রতিভায় ও মহানুভবতায় তিনি ছিলেন আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শাসক বিশ্ব ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। তবে তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল বলে মনে হয়। সমসাময়িক জনগণ তাঁকে বুঝতে পারেনি। ঐতিহাসিকগণও তাঁর প্রতি খুব একটা সুবিচার করেন নি। রক্তলোলুপ, নিষ্ঠুর, ধর্মবিমুখ, স্বাপ্নিক - তিনি এর কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন একজন শাসক যাকে সকলেই ভুল বুঝেছে। এদিক থেকে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় যোশেফের সাথে তুলনা করা যায়। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের ন্যায় তিনি ছিলেন 'পন্ডিতমূর্খ'।

তিনি ছিলেন তার যুগের জনসাধারণ অপেক্ষা চিন্তা-চেতনায় অনেক বেশি অগ্রসর। জ্ঞানে, গুণে, প্রতিভায় ও মহানুভবতায় তিনি ছিলেন আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি

শাসক হিসেবে মুহম্মদ বিন তুঘলক সফল হতে পারেন নি। যথেষ্ট সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। কোনটা সম্ভব, আর কোনটা সম্ভব নয় এই পরিমিতি বোধ বোধহয় তাঁর ছিল না। তিনি সারা পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলেন। সকল মানুষকে স্বমতে ও স্ববশে আনা যে সম্ভব নয় তা তিনি মানতে চান নি। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেন। প্রথমদিকে তাঁর সাম্রাজ্য ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর শাসনামলের শেষভাগে

শাসক হিসেবে মুহম্মদ বিন তুঘলক সফল হতে পারেন নি

সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্বাধীন বিজয়নগর, বাংলা ও বাহমনী রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাঁর চোখের সামনে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এই ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় তিনি শাসন বিষয়ে আলেমদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। বহু হিন্দু তাঁর শাসনামলে উচ্চ রাজকাজে অধিষ্ঠিত ছিল। তিনি চাষীদের মঙ্গলের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগের নাম ছিল 'দিওয়ান-ই-কোহী'। অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা, চাষীদের তাকাভি ঋণদান, দুর্ভিক্ষের সময় জনগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা ইত্যাদি ছিল এই বিভাগের কাজ। মুহম্মদ বিন তুঘলক নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। অপরাধীর পদমর্যাদা কিংবা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক তাকে শাস্তি পেতেই হতো। জনগণ ইচ্ছা করলে সুলতানের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অভিযোগ করতে পারত। ইবনে বতুতা সুলতানের নিরপেক্ষ বিচারের প্রশংসা করেছেন। দৌলতাবাদে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, প্রতীক মুদ্রার প্রচলন, দোয়াবে কর বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণের পেছনে যুক্তিসংগত কারণ ছিল। জনগণ বুঝতে পারেনি বলে সুলতানের মহৎ পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য সুলতানকে এককভাবে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল। শাসক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনপুল বলেছেন, "তিনি যা ভালো মনে করতেন তা অবিলম্বে করার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন, তা ব্যর্থ প্রমাণিত হলে তাঁর আশাভঙ্গের বেদনা উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যেতো। যারা তাঁর সাথে সমতালে চলতে পারতো না তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়তো সেই সমস্ত হতভাগ্যের উপর। সুতরাং সদিচ্ছা ও অসাধারণ কল্পনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্য, ধৈর্য ও পরিমিতিবোধের অভাবে মুহম্মদ বিন তুঘলক সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন।" প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, কর্মচারী ও জনগণের অসহযোগিতার কারণে সুলতানের পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হলেও এগুলোকে অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা উচিত হবে না। পরিকল্পনাগুলো ভালো ছিল, তবে এগুলো ছিল যুগ থেকে অনেক বেশি অগ্রসর চিন্তার ফসল। তাই এগুলো ব্যর্থ হয়। সুলতান নিজেও ব্যর্থতার গ্লানি সংগে করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বলা হয়, তিনিও জনগণের কাছ থেকে মুক্তি পেলেন এবং জনগণও তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পেলো।

মুহম্মদ বিন তুঘলক নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। অপরাধীর পদমর্যাদা কিংবা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক তাকে শাস্তি পেতেই হতো

জনগণ বুঝতে পারেনি বলে সুলতানের মহৎ পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়

সার-সংক্ষেপ

মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী শাসক। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। চিন্তা চেতনায় তিনি ছিলেন যুগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল। তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। কৃষকদের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক শাসক হিসেবে সফল হতে পারেন নি। তাঁর গৃহীত পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়। তবে এজন্য একা সুলতানকে দায়ী করা যায় না। জনগণ তাঁর মহৎ পরিকল্পনাগুলো বুঝতে পারেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। এডওয়ার্ড টমাস, এলফিনস্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে মন্তব্য—
ক. সদাশয় সুলতান।
খ. মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক।
গ. বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ।
ঘ. পারিপার্শ্বিকতার কারণে কঠোর।

২। সুলতান যে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না তাঁর প্রমাণ—
ক. হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন।
খ. তাদের খাজনা মাফ করে দেন।
গ. তাদের মন্দির সংস্কার করে দেন।
ঘ. তাদেরকে দৌলতাবাদ যেতে বাধ্য করেননি।

৩। অপরাধী আইনুল মুলককে দমন করার পর তাঁর সম্পর্কে সুলতানের সিদ্ধান্ত–
ক. মৃত্যুদন্ড প্রদান।
খ. ক্ষমা।
গ. পদচ্যুতি।
ঘ. পদোন্নতি।

৪। সুলতানের নিরপেক্ষ বিচারের প্রশংসা করেছেন–
ক. জিয়াউদ্দীন বারণী।
খ. ইসামী।
গ. আমীর খসরু।
ঘ. ইবনে বতুতা।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. 'সুলতানের চরিত্র ছিল বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ' - ব্যাখ্যা করুন।
২. 'মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন উচুঁ দরের পণ্ডিত' - মূল্যায়ন করুন।
৩. 'জনগণ বুঝতে পারেননি বলে সুলতান মুহম্মদ তুঘলঘের মহৎ পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়' –বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৫

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি:)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফিরোজ শাহের শাসন সংস্কার পর্যালোচনা করতে পারবেন।
- ফিরোজ শাহের জনহিতকর কার্যাবলী মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসন লাভ

থাট্টায় মুহম্মদ বিন তুঘলকের হঠাৎ মৃত্যু হয়। সুলতানের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। অভিজাতগণ সুলতানের চাচাত ভাই ফিরোজকে সিংহাসনে বসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ফিরোজ প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমীরদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তাকে রাজী হতে হয়। ১৩৫১ সালের ২৪ মার্চ তিনি ফিরোজ শাহ তুঘলক নাম নিয়ে সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। থাট্টা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে মৃত সুলতানের খাজা-ই-জাহান নামক একজন অনুচর একটি শিশুকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। তিনি দাবি করেন যে, শিশুটি মৃত সুলতানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ফিরোজ তুঘলক দিল্লী এসে পৌঁছলে খাজা-ই-জাহান আত্মসমর্পন করেন। ফিরোজ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর মৃত চাচাত ভাইয়ের আত্মঘাতে শান্তি পায় তার জন্য সুলতান ফকির দরবেশ ও গরিব-দু:খীর মধ্যে প্রচুর দান-খয়রাত করেন। এ থেকে মৃত সুলতানের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলা অভিযান

ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন শান্তিপ্রিয় লোক। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যজয় কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ তেমন একটা হয়নি। মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাংলা দিল্লীর হাতছাড়া হয়ে যায়। ইতোমধ্যে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ গোটা বাংলা জয় করে ফেলেছেন। ফিরোজ তুঘলক দু'বার বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। একবার ইলিয়াস শাহের সময় ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে এবং আর একবার ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। দুবারই বাংলার সুলতানদ্বয় একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় নেন। ফলে দিল্লী বাহিনীর অভিযান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অভিযান থেকে ফেরার পথে ফিরোজ শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) দখল করেন এবং জাজনগরের রাজার কাছ থেকে উপঢৌকন লাভ করেন। সুলতান দু'বার চেষ্টা করে থাট্টা (সিন্ধু) দখল করেন। তিনি সিন্ধুর 'জাম'-কে অপসারণ করে তাঁর ভাইকে সিংহাসনে বসান। সুলতান দক্ষিণ ভারত দখলের কোন চেষ্টা করেন নি। তবে গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিলে সে বিদ্রোহ তিনি কঠোরহাতে দমন করেন।

শাসক হিসেবে

যোদ্ধা হিসেবে তেমন খ্যাতিলাভ না করলেও শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলক অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী জনদরদি শাসক। জনকল্যাণই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনে জনগণের মনে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তা দূর করেন। তিনি শুধু চার প্রকার কর আদায় করতেন। এগুলো ছিল খারাজ, জাকাত, জিজিয়া ও খুমস। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার কর তিনি উঠিয়ে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি অনেক প্রান্তিক কর উঠিয়ে দেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এজন্য ১৫০টি কূপ ও ৪টি খাল খনন করা হয়। পূর্বতন সুলতানের আমলে কৃষকদের যে ঋণ দেয়া হয়েছিল ফিরোজ শাহ তা মাপ করে দেন। সুলতানের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আসে। রায়তরা ধনীও সন্তুষ্ট হয়। শামস-ই-সিরাজ আফিফ বলেন, "প্রতিটি গৃহ খাদ্যশস্য, ঘোড়া ও বিছানাপত্রে পূর্ণ ছিল। প্রত্যেক পরিবারে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাচুর্য ছিল। মহিলাদের প্রচুর অলঙ্কার ছিল। সাধারণ মানুষও সুখী জীবন-যাপন করত।"

শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলক অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন

ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি প্রভৃতি খুচরা মুদ্রা চালু করেন

ফিরোজ শাহ তামা ও রূপা মিশিয়ে একধরনের মুদ্রা চালু করেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি প্রভৃতি খুচরা মুদ্রা চালু করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময় মুদ্রা নিয়ে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, ফিরোজ শাহের সময় তা প্রশমিত হয়। তাঁর রাজত্বকালে শরিয়তি আইন অনুসারে বিচার কাজ চলতো। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন, আর কাজী করতেন রায় প্রদান।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত

ফিরোজ শাহ তুঘলক জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাগুলো "পিতামহীসুলভ ব্যবস্থা" নামে পরিচিত। যৌতুকের অভাবে যে সকল বিবাহযোগ্য মুসলিম বালিকার বিয়ে হতোনা, তাদেরকে "বিবাহ দপ্তর" থেকে সাহায্য দেয়া হতো। বেকার যুবকদের চাকুরি পাওয়ার সুবিধার জন্য সুলতান 'চাকুরি দপ্তর' খোলেন। অনাথ, বৃদ্ধ ও দরিদ্রদের দান বিভাগ (দিওয়ান-ই-খয়রাত) থেকে সাহায্য করা হতো। দিল্লীতে সুলতান একটি বিরাট হাসপাতাল খুলেছিলেন। একে বলা হতো 'দার-উস-সাফা'। এখানে দক্ষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দরিদ্র রোগীদের রাষ্ট্রীয় খরচে ঔষধ দেয়া হতো। ফিরোজ একজন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি অনেকগুলো শহর ও মসজিদ নির্মাণ করেন। দিল্লীতে একটি নতুন শহর নির্মাণ করে সুলতান এর নাম দেন 'ফিরোজাবাদ'। এছাড়া তিনি ফতেহাবাদ, জৌনপুর, ফিরোজপুর প্রভৃতি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমস্ত শহরে তিনি অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, পুকুর, বাগান, সমাধিসৌধ, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। খাল কেটে শহরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ফিরোজ শাহ ৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০ পান্থশালা, ৫টি কূপ, ৫টি চিকিৎসালয়, ১০টি গোসলখানা, ১০০টি সেতু এবং ১০টি কবরস্থান নির্মাণ করেছিলেন। তিনি অনেকগুলো রাজপথও নির্মাণ করেছিলেন। অশোকের স্মৃতিস্তম্ভগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। অশোকের দুটি স্তম্ভ তিনি দিল্লীতে এনে পুন:স্থাপন করেছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর আমলের প্রায় ৩০টি বাগান তাঁর সময় সংস্কার করা হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠে তিনি ১২০০ বাগান নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

সুলতান সামন্তপ্রথার উপর ভিত্তি করে তাঁর সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সৈন্যদের জায়গীর দেয়া হতো। কোন সৈন্য বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়লে তার জায়গায় তার পুত্রকে, পুত্র না থাকলে জামাতাকে এবং জামাতাও না থাকলে তার ক্রীতদাসকে চাকুরি দেয়া হতো। সন্দেহ নেই, এই নীতির ফলে সৈন্যবাহিনীর সার্বিক দক্ষতা ব্যাহত হয়।

সুলতান 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' নামে একটি বিভাগ খোলেন। রাষ্ট্রীয় কাজে প্রায় ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস নিয়োজিত ছিল। তাদের সুষ্ঠুভাবে ভরণ-পোষণ করা হতো।

ফিরোজ শাহ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন

ফিরোজ শাহ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তাঁর দরবারে জ্ঞানী-গুণীর সমাদর ছিল। তিনি অনেকগুলো মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী ও শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের গ্রন্থগুলো রচনা করেন। সুলতান নিজেও একজন ভালো লেখক ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'ফতুহা-ই-ফিরোজশাহী' সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতানের মৃত্যু হয়। মোরল্যান্ডের মতে, তাঁর মৃত্যু একটি যুগের অবসান ঘটায়।

সার-সংক্ষেপ

মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলক সুলতান হন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় শাসক। তাঁর শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বিজয় ঘটেনি। তিনি দুবার বাংলা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ফিরোজশাহ জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক অন্যায় কর রহিত করেন। তিনি কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি অনেক কূপ, খাল ইত্যাদি খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেন। অনেক সুন্দর সুন্দর শহর, অট্টালিকা, মসজিদ ইত্যাদি তাঁর সময় নির্মিত হয়। তিনি অনেকগুলো বাগান, পুল, রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করেন। জনকল্যাণে তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করতেন। দরিদ্র ও অনাথদের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য করা হতো। তার শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় "পিতামহী সুলভ" শাসন ব্যবস্থা। তিনি জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'খাজা-ই-জাহান' ছিলেন–
ক. মুহম্মদ বিন তুঘলকের একজন অনুচর।
খ. মুহম্মদ বিন তুঘলকের চাচাত ভাই।
গ. মুহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী।
ঘ. একজন মোঙ্গল আক্রমণকারী।

২। ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা অভিযান করেন–
ক. একবার।
খ. দু'বার।
গ. তিনবার।
ঘ. চারবার।

৩। জলসেচের জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় খাল খনন করা হয়–
ক. ১০ টি।
খ. ৬ টি।
গ. ৪ টি।
ঘ. ২ টি।

৪। ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হয়–
ক. ১৩৬৮ সালে।
খ. ১৩৭৮ সালে।
গ. ১৩৮০ সালে।
ঘ. ১৩৮৮ সালে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসন আরোহণের বিষয় সংক্ষেপে লিখুন।
২. ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে বাংলা অভিযান সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।
৩. 'ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত ব্যবস্থাগুলো ছিল পিতামহীসুলভ ব্যবস্থা' –আলোচনা করুন।
৪. ফিরোজ শাহ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন - ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬

ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মানুষ ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লী সালতানাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও ন্যায়বান মানুষ। ধর্মকর্মে তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। তাঁর মানবপ্রেমের তুলনা হয় না। তিনি হৃদয় দিয়ে গরিব-দু:খী, অনাথ এতিমের সেবা করতেন। এজন্য অনেকগুলো দাতব্য বিভাগ রাষ্ট্রীয় খরচে পরিচালিত হতো। এতে রাষ্ট্রের ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। অনেক অন্যায় কর তিনি তুলে দেন। শাস্তিদানের কঠোরতা তিনি হ্রাস করেন। তিনি নিজে পন্ডিত ছিলেন এবং পন্ডিতদের সাহচর্য কামনা করতেন। নিজ ধর্মে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। নগরকোট বিজয়ের সময় কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁর হাতে আসে। তিনি এগুলো ফারসি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অশোকের দুটি স্তম্ভ তিনি দিল্লীতে স্থানান্তরিত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এগুলো তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বহর করে। তাঁর আত্মজীবনী 'ফতুহা-ই-ফিরোজশাহী' সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। জিয়াউদ্দীন বারণী, শামস-ই-সিরাজ আফিফ প্রমুখ ঐতিহাসিক ও পন্ডিতকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও ন্যায়বান মানুষ। ধর্মকর্মে তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল

শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ ছিলেন জনদরদি ও প্রজাবৎসল। শুধুমাত্র জনকল্যাণের জন্যই তাঁর শাসনযন্ত্র নিয়োজিত ছিল। তাঁর প্রায় সাইত্রিশ বছর শাসনকালে প্রজাপীড়নের কোন ঘটনা কখনো ঘটেনি। বিবাহ দপ্তর, চাকুরি দপ্তর, দান বিভাগ, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর প্রজা হিতৈষণার স্বাক্ষর বহন করে। বহু অন্যায় কর তুলে দিয়ে তিনি জনগণের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি দন্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এজন্য বহু কূপ ও খাল খনন করা হয়। তিনি অসংখ্য শহর, প্রাসাদ, রাস্তা, বাগান ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এর ফলে কর্মসংস্থান হয়। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও তাঁর লক্ষ ছিল। এজন্য তিনি পয়:প্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। সেই মধ্য যুগে চিকিৎসালয় স্থাপন করে বিনা খরচে রোগীদের ঔষধ-পথ্য সরবরাহ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ ছিলেন জনদরদি ও প্রজাবৎসল

ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর কোন কোন পদক্ষেপ পরবর্তীকালে দিল্লী সালতানাতের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সৈন্যবাহিনীতে জায়গীর প্রথার প্রবর্তন করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। দাস-দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিণামে তা সালতানাতের জন্য দুর্বিষহ বোঝা বলে প্রমাণিত হয়। সৈন্যবাহিনীতে অযাচিত উদারতাও সৈন্যদলের মনোবল ও যুদ্ধস্পৃহা কমিয়ে দেয়। যার ফলে তৈমুর লং-এর আক্রমণের সময় দিল্লী বাহিনী সামান্যতম প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারেনি। এজন্য ফিরোজ শাহ তুঘলককে দিল্লী সালতানাতের পতনের জন্য আংশিকভাবে হলেও দায়ী করা যায়।

সে যাই হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জনসাধারণের জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলকের দরদ ছিল আন্তরিক। জনগণের জন্য তাঁর 'পিতামহী সুলভ' মমত্ববোধ তাঁকে দিল্লীর অন্যতম মহৎ শাসকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জনকল্যাণ যদি কোন শাসকের কৃতিত্ব পরিমাপের মানদন্ড হয় তাহলে ফিরোজ শাহ তুঘলককে দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে।

জনগণের জন্য তাঁর 'পিতামহী সুলভ' মমত্ববোধ তাঁকে দিল্লীর অন্যতম মহৎ শাসকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে

সার-সংক্ষেপ

ফিরোজ শাহ উদার ও ন্যায়বান মানুষ ছিলেন। তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পন্ডিতদের সাহচর্য ভালবাসতেন। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল। তিনি সব সময় প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি বহু অন্যায় কর তুলে দেন। দন্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শাসনামলে অনেক শহর, প্রাসাদ, রাস্তা-ঘাট, পুল, বাগান ইত্যাদি নির্মিত হয়। অনেক মানুষ কাজ পায়। প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করে। ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নগরকোটে প্রাপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলো ফিরোজ শাহ তুঘলক–
ক. পুড়িয়ে ফেলেন।
খ. বাংলা ভাষায় অনুবাদ করান।
গ. ফারসি ভাষায় অনুবাদ করান।
ঘ. নদীতে নিক্ষেপ করেন।

২। অশোকের দুটি স্তম্ভ ফিরোজ শাহ তুঘলক স্থাপন করেন–
ক. লাহোরে।
খ. দিল্লীতে।
গ. জৌনপুরে।
ঘ. ফতেহাবাদে।

৩। ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজত্ব করেন–
ক. প্রায় ২৫ বছর।
খ. প্রায় ৩৩ বছর।
গ. প্রায় ৩৫ বছর।
ঘ. প্রায় ৩৭ বছর।

৪। জায়গীর প্রথা প্রবর্তন করার ফলে–
ক. কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
খ. দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।
গ. দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
ঘ. অনেক মানুষ কাজ পায়।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উদার ও ন্যায়বান মানুষ - ব্যাখ্যা করুন।
২. শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ ছিলেন জন দরদি ও প্রজাবৎসল - মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৭

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণের অব্যবহিত আগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ মারাত্মক গৃহবিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তাঁর দুই পৌত্র গিয়াসউদ্দীন ও আবুবকর পর পর সিংহাসনে বসেন। এঁরা ছিলেন পরস্পর চাচাত ভাই। এদের দুজনেরই রাজত্বকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। এরপর সিংহাসনে বসেন ফিরোজ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ শাহ। তিনি ১৩৯০ থেকে ১৩৯৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সুলতান হন তাঁর পুত্র হুমায়ুন। অল্পকালের মধ্যে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সিংহাসন দখল করেন হুমায়ুনের চাচাত ভাই নসরত শাহ। তিনি ১৩৯৫ থেকে ১৩৯৯ পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর পিতৃব্যপুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হন। এভাবে ১৩৮৮ থেকে ১৩৯৯ পর্যন্ত মাত্র এগার বছর সময়ের মধ্যে মোট ছয়জন সুলতান ক্ষমতায় অভিষিক্ত হন। তাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী আমীরদের হাতে ক্রীড়নক। আমীরগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা হিন্দুস্তানি, ইরানি, তুরানি, খলজী, ইলবারি, করৌনা প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশের স্বার্থ অপেক্ষা হীন গোষ্ঠী স্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সৈন্যবাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল ও যুদ্ধবিমুখ। প্রশাসনযন্ত্র একেবারেই ভেংগে পড়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সমরকন্দের অধিপতি আমীর তৈমুর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের উত্তরাধিকারীগণ মারাত্মক গৃহবিবাদে জড়িয়ে পড়ে

তৈমুর লং -এর ভারত আক্রমণ

তৈমুর ছিলেন তুর্কী চাগতাই বংশীয়। খোঁড়া ছিলেন বলে তাঁকে 'লং' বলা হতো। তিনি ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্তান দখল করে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে রাজ্যস্থাপন এবং ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন এই দুই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে প্রায় বিনা বাধায় ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন। সুলতান মাহমুদ শাহের সৈন্যবাহিনী নামেমাত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে পরাজিত হয় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৈমুর দিল্লীতে বিজয়গৌরবে প্রবেশ করেন। তিনি দিল্লীবাসীকে অভয় দেন যে অকারণে কাউকে হত্যা করা হবেনা। তবে বিনিময়ে তাঁকে প্রচুর অর্থ নজরানা দিতে হবে। অর্থ সংগ্রহের সময় সৈন্যদের ব্যবহারে দিল্লীবাসীগণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত আক্রমণে কয়েকজন সৈন্য মারা যায়। এতে তৈমুর দিল্লীর অধিবাসীদের উপর মারাত্মক প্রতিশোধের আদেশ দেন। নির্বিচারে গণহত্যা চলতে থাকে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায়নি। পঁচিশ দিন অবস্থানের পর তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় প্রচুর সম্পদ ও অগণিত যুদ্ধবন্দী নিয়ে যান। দিল্লী এক ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। পথে তৈমুর মীরাট, আগ্রা ও জম্মু লুণ্ঠন করেন। ভারত ত্যাগের আগে তিনি তাঁর অনুচর খিজির খানকে মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তৈমুর ভারত ত্যাগ করেন, কিন্তু পেছনে রেখে যান "ভয়, ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ এবং মড়কের এক ভীতিপ্রদ কাহিনী"।

তৈমুর দিল্লীর অধিবাসীদের উপর মারাত্মক প্রতিশোধের আদেশ দেন। নির্বিচারে গণহত্যা চলতে থাকে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায়নি। পঁচিশ দিন অবস্থানের পর তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করেন

ফলাফল

তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লী সালতানাতের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়। অসংখ্য নিরীহ নারী-পুরুষ নিহত হয়। গ্রাম-গঞ্জ, ফসলের মাঠ, শস্যগোলা, সমৃদ্ধ লোকালয়, মন্দির-মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রশাসন-যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। উত্তর-পশ্চিম ভারত মহাশ্মশানে পরিণত হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এবং জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে প্রায় পঞ্চাশ বছর লেগেছিল।

তৈমুরের আক্রমণ তুঘলক বংশের উপরও ভয়াবহ আঘাত হানে। তৈমুরের ভারত ত্যাগের পর মাহমুদ শাহ দিল্লী ফিরে এলেও গৌরব ফিরে পেলেন না। পূর্বে যে সামান্য শাসনক্ষমতা তাঁর ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে গেলো। একের পর এক প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি বলতে গেলে শূণ্যের কোঠায় নেমে আসে। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তুঘলক বংশের অবসান ঘটে। তৈমুরের প্রতিনিধি খিজির খান দিল্লী দখল করে সেখানে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈমুরের আক্রমণ শুধু তুঘলক বংশের অবসান ঘটায় নি, দিল্লী সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের জন্যও তা দায়ী ছিল। বস্তুত: দিল্লী সালতানাত তার পূর্ব গৌরব আর কোন দিনই ফিরে পায় নি। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরের বংশধর বাবুরের আক্রমণে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে। তদস্থলে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

তৈমুরের আক্রমণে ভারত ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সমরকন্দ তথা মধ্য এশিয়া লাভবান হয়। ভারতের প্রচুর সম্পদ সেখানে পাচার হয়। যাওয়ার সময় তৈমুর ভারত থেকে একদল স্থপতি, শিল্পী ও শ্রমিক নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যরীতিতে সমরকন্দে বহু সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা যায়। এই সুযোগে সমরকন্দের আমীর তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। দুর্বল মাহমুদ শাহ তুঘলক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লী লুণ্ঠন করেন। বহু নিরপরাধ নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ হতাহত হয়। পঁচিশ দিন ধরে লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করেন। ভারত ত্যাগের আগে তিনি মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনভার তাঁর অনুচর খিজির খানের উপর দিয়ে যান। মাহমুদ শাহ দিল্লী ফিরে এলেও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। তৈমুরের আক্রমণের সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে দিল্লী সালতানাত ধ্বংস হয়। তৈমুরের আক্রমণের ফলে দেশ ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পতিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ শাহের পর সুলতান হন–
ক. গিয়াসউদ্দীন।
খ. আবুবকর।
গ. নসরতশাহ।
ঘ. হুমায়ুন।

২। আমীর তৈমুরের বংশ–
ক. তুর্কী চাগতাই।
খ. ইলবারি তুর্ক।
গ. মোঙ্গল।
ঘ. আফগান।

৩। তৈমুরের ভারত আক্রমণের সময় দিল্লীর সুলতান কে ছিলেন?
ক. মুহম্মদ শাহ।
খ. মাহমুদ শাহ।
গ. নসরত শাহ।
ঘ. খিজির খান।

৪। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন–
ক. ফিরোজ শাহ।
খ. নসরত শাহ।
গ. মাহমুদ শাহ।
ঘ. মুহম্মদ শাহ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. তৈমুর লং -এর ভারত আক্রমণের পূর্বে ফিরোজশাহের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে গৃহবিবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. তৈমুর লং -এর ভারত আক্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১১ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা বর্ণনা করুন।
২. মানুষ ও শাসক হিসেবে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মূল্যায়ন করুন।
৩. শাসক হিসেবে মুহম্মদ বিন তুঘলকের মূল্যায়ন করুন।
৪. মুহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন বর্ণনা করুন।
৫. সুলতানের প্রতীক মুদ্রা প্রচলন পর্যালোচনা করুন।
৬. সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন কেন? এই হার কত ছিল? কেন এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়?
৭. সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র পর্যালোচনা করুন।
৮. সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
৯. ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন সংস্কার পর্যালোচনা করুন।
১০. ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলী মূল্যায়ন করুন।
১১. নির্মাতা হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরিচয় দিন।
১২. ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র আলোচনা করুন।
১৩. শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মূল্যায়ন করুন।
১৪. তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১১.১	ঃ	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ১১.২	ঃ	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ
পাঠ ১১.৩	ঃ	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ
পাঠ ১১.৪	ঃ	১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ১১.৫	ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ
পাঠ ১১.৬	ঃ	১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. খ
পাঠ ১১.৭	ঃ	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. গ